Vol. 18 | No. 1 | 1974

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার

Volume	18
Issue	1
Year	1974
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকুল ইসলাম
Published online	June 1, 1974
DOI	10.62328/sp.v18i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v18i1.1
Pages	1-13
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
অষ্টাদশ বর্ষ : প্র
বাংলা বিভাগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
Check for updates

নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার

রফিকুল ইসলাম

সার্থক উপমা অলঙ্কার প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত মহাকবি কালিদাসের অলঙ্কার ঐতিহ্য 'উপমা কালিদাসস্য' নামে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে উপমা অর্থে কেবল উপমা অলঙ্কার নয় বরং উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ইত্যাদি সাদৃশ্যাত্মক সকল অলঙ্কারকেই নির্দেশ করা হত। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে মোট উপমার সংখ্যা সাড়ে বারো শত। খণ্ডকাব্য 'মেঘদূত'-এ পাই চারশত আটষট্টি চরণে পঞ্চাশটি উপমা। প্রাচীন কবি কালিদাসের সঙ্গে আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের তুলনায় দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' কবিতায় তিনশত আটত্রিশটি চরণে রয়েছে চুরাশীটি উপমা। আর 'বলাকা' কবিতায় পঁয়ষট্টিটি চরণে চব্বিশটি উপমা। প্রাচীন কালে উপমার রাজা কালিদাস আর আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ।

প্রাচীন কাব্য-রসিকেরা, বিশেষতঃ সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা, কাব্যালোচনায় উপমা ও রূপকের প্রাধান্য দিতেন আর সে কারণেই কালিদাসের উপমা প্রয়োগের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। গ্রীক ও রোমান আলঙ্কারিকেরা উপমা ও রূপকের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রেণী বিভাগ করেছেন। আবার সংস্কৃত, গ্রীক ও রোমান কাব্যরসিকেরা সকলেই 'ইমেজ' বা 'চিত্রকল্প'কে অলঙ্কার মাত্র বিবেচনা করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে কবিতার প্রাণ চিত্রকল্পের ব্যবহারে, তাঁদের মতে তার মধ্যেই কবির ভাবজগত প্রতিফলিত। আর সার্থকভাবে চিত্রকল্প আলোচনার মাধ্যমেই কেবলমাত্র কবির সৃজনীপ্রতিভার কাছে পেঁাছানো যেতে পারে, যে সৃজনীপ্রতিভা হল কবি ও তাঁর সৃষ্টি-রহস্যের চাবিকাঠি। ইংরেজী কবিতার আলোচনায় ইমাজিনেশন থেকে এসেছে ইমেজ আর বাংলা কবিতায় কল্পনা বা বাককল্প থেকে চিত্রকল্প। কবিতায় এক একটি সার্থক চিত্রকল্পে কবির সৃষ্টিমুহূর্তের মানস-রহস্য উদ্ভাসিত। এক একটি

চিত্রকল্প যেন কবি-কল্পনার দ্বারোদ্ঘাটন। নজরুলের কবিতায় উপমার তুলনায় চিত্র-কল্পের ব্যবহার বেশী, চিত্রকল্পের মধ্যে নজরুলে দৃশ্যরূপময় চিত্রকল্পের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, রসনা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণের উপলব্ধিতে বিধৃত দৃশ্য ও ধ্বনিরূপময় চিত্রকল্পের প্রাধান্য সচরাচর কবিতায় দেখা যায়। নজরুলের চিত্রকল্পগুলি মূলতঃ চিত্রধর্মী অর্থাৎ দৃশ্যময়তা সেখানে প্রধান। যেমন, 'শাত-ইল-আরব' কবিতার নিম্নোক্ত চিত্রকল্পটি দৃশ্যরূপময় :

দুষমন্ লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল্‌মিল

কিন্তু 'আগমনী' কবিতার নিম্নোক্ত চিত্রকল্পটিতে দৃশ্যময়তার সঙ্গে ঘ্রাণময়তা যুক্ত হয়েছে ঃ

আজ আকাশ-ডোবানো নেহারি তাহারি চাওয়া
ঐ শেফালিকা-তলে কে বালিকা চলে ?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন হাওয়া ?

উদ্ধৃত প্রথম চিত্রকল্পটিতে যেখানে একটি নদীকে কেন্দ্র করে কবির আবেগ উৎসারিত সেখানে চিত্রধর্মী চিত্রকল্পই যথার্থ কিন্তু দ্বিতীয়টিতে দুর্গা দেবীর আগমনের সময়ের সঙ্গে বাংলার শরৎ প্রকৃতির সম্পর্কের কারণে স্বাভাবিকভাবেই শেফালি ফুলের সৌরভকে চিত্রকল্পে ধারণ করতে হয়েছে। 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় কেয়ামত রাত্রির ভয়াবহতাকে দৃশ্যময় করার জন্যে দৃশ্যরূপময় বা চিত্রধর্মী চিত্রকল্পের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে ধ্বনির গম্ভীর নির্ঘোষ অনুপ্রাসের সাহায্যে :

নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গতরঙ্গ
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ।

এ চিত্রকল্প পরিচিত জীবন থেকে আহরিত। বর্ষার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ প্রমত্ত নদীর করাল রূপ নদীমাতৃক বাঙালী জীবনে অত্যন্ত পরিচিত, কেয়ামত রাত্রির বর্ণনায় সে পরিচিত দৃশ্যকে ব্যবহার করে কবি ত্রাস ও শঙ্কাহত পাপীদের অসহায় অবস্থাটিকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে দৃশ্যমান করে তুলেছেন। "খেয়াপারের তরণী" কবিতার চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকে পুণ্যবানদের খেয়াপারের দৃশ্য বর্ণনায় কবি যে চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন, তা-ও জীবন থেকে নেয়া :

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ী-মুখে সারি গান—লা-শরীক আল্লাহ্।

চিত্রকল্পটি বাংলার নদ-নদীতে ভাসমান নৌকা ও মাঝি-মাল্লাদের চির-পরিচিত দৃশ্য থেকে সংগৃহীত, দাঁড়ী মুখ মাঝি-মাল্লাদের সারি গান গেয়ে দাঁড় বেয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমাদের পরিচিত। অভিনবত্ব এসেছে "লা-শরীক আল্লাহ" এই আরবী বাক্যাংশের সংযোজনে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টিতে। আলোচ্য কবিতাটির ষষ্ঠ স্তবকে পাই বিচিত্র ঐতিহ্য থেকে আহরিত এক অভিনব চিত্রকল্প :

'শাফায়াত'-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত' হতে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,

চিত্রকল্পটির প্রথম অংশটি ইসলাম ঐতিহ্য সম্পৃক্ত কিন্তু শেষ অংশটি বাঙালী হিন্দুর পরিচিত অভিজ্ঞতা থেকে চয়ন করা, বিপরীতধর্মী ঐতিহ্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে চিত্রকল্প নির্মাণে নজরুল যে সিদ্ধহস্ত উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি তারই পরিচয়বহ।

'মোহর্‌রম' কবিতায় একাধারে দৃশ্যময় ও ধ্বনিময় চিত্রকল্পের সমারোহ দেখতে পাই। কারবালার বিষাদ আর মর্সিয়াকে শব্দচিত্রময় করে তোলার জন্যে নজরুলকে ঐ দুই শ্রেণীর চিত্রকল্প প্রয়োগ করতে হয়েছে এ কবিতায়। কবিতাটির প্রথম দুইটি চরণের চিত্রকল্পে রক্তিম বর্ণের আধিক্য লক্ষণীয় :

নীল সিয়া আস্‌মান লালে লাল দুনিয়া
আম্মা ! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া

আকাশের রঙ্ সিয়া বা কৃষ্ণবর্ণ শোকের রঙ্ কিন্তু পৃথিবীর রঙ্ লাল যা কারবালার রক্তের বর্ণ, কারবালার নিষ্ঠুর রক্তাক্ত শোকাবহ ঘটনায় প্রকৃতির মুহ্যমান রূপের চিত্রকল্প সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এসেছে বিধবাদের ক্রন্দন রেশ :

কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে

কারবালা ফোরাতে ক্রন্দসীদের রোদনে ঘাতক সীমারের ছোরাতে হোসেনের শোকে অশ্রুর আভাস একটি অভিনব কল্পনা, শোকের বর্ণনা এর চেয়ে নিখুঁত হত কি অন্য চিত্রকল্পে ? কবিতায় আর একটি চিত্রকল্প :

মা ফাতিমা আস্‌মানে কাঁদে খুলি কেশপাশ
বেটাদের লাশ নিয়ে বধূদের শ্বেত বাস।

সন্তানের মৃত্যুতে মাতার এলোকেশে ক্রন্দন হাহাকার কিংবা পতির লোকান্তরে স্ত্রীর বৈধব্যের প্রতীক শ্বেত বাস বাঙালী জীবনের পরিচিত শোকদৃশ্য, এ পরিচিত অভিজ্ঞতাকে নজরুল কারবালার বিষাদ বর্ণণায় সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। আর একটি চমৎকার চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে হজরত ইমাম হাসান পুত্র কাসিম ও হজরত ইমাম হোসেন কন্যা সখিনার সদ্য বিবাহ ও বৈধব্যের করুণ দৃশ্য উন্মোচনে :

রণে যায় কাসিম ঐ দু' ঘড়ির নওশা
মেহেদীর রঙটুকু মুছে গেল সহসা।

দু'ঘড়ির নওশা বা ক্ষণকালের দুলা কাসিম ,তার শাহাদাতে সখিনার সদ্য বিবাহিত জীবনের অবসানের করুণ ঘটনাটি "মেহেদীর রঙটুকু মুছে গেল সহসা" চিত্রকল্পটির মধ্য দিয়ে যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। সখীনা বেদনার প্রতিমূর্তি রূপে প্রতিভাত—যার চিত্রকল্প :

কেঁদে গেছে থামি হেথা মৃত্যু ও রুদ্র,
বিশ্বের ব্যথা যেন বালিকা ও ক্ষুদ্র।

উদ্ধৃতির শেষ চরণের উৎপ্রেক্ষাটিতে বেদনার ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারবালার ঘটনা বিষাদান্ত হবার একটি কারণ দারুণ মরুভূমিতে শত্রু সৈন্য বেষ্টিত হোসেনের শিবিরে পানির অভাব, হোসেন শিবিরের তৃষ্ণার হাহাকার ধরা পড়েছে নজরুলের কবিতায় ধ্বনিময় চিত্রকল্পে :

নিয়ে তৃষা সাহারার দুনিয়ার হাহাকার
কারবালা প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার।

মরুভূমির রৌদ্রদগ্ধ রূপ চিত্রায়িত হয়েছে দৃশ্যময় উপমা ও চিত্রকল্পে :

কলিজা কাবাব-সম ভুনে মরু রোদ্দুর
খাঁ খাঁ করে কারবালা নাই পানি খর্জুর।

হজরত ইমাম হোসেনের শাহাদাতে শোকের যে ছায়া নেমে এসেছিল তার বর্ণণাতেও দৃশ্যময় চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে :

হলকুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে ?
আফ্‌তাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে
আস্‌মান ভ'রে গেল গোধূলিতে দুপুরে।
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে

ঐ মৃত্যুতে সবচেয়ে অধিক শোকাহত মাতা, মা ফাতেমার বেদনার চিত্রকল্প, সন্তানহারা মাতার শোকের চিরন্তন রূপ এই :

বেটাদের লোহু-রাঙা পিরহান হাতে, আহ্—
'আরশে'র পায়া ধরে কাঁদে মাতা ফাতেমা।

"মোহররম" কবিতায় ক্রন্দনের ধ্বনি ও দৃশ্য বার বার চিত্রকল্পে পরিণত হয়ে কারবালার বেদনা ও বিষাদকে ধ্বনি ও দৃশ্যময় করে তুলেছে। মোহররম ও কারবালার বেদনার কাহিনী নিয়ে রচিত বেশ কয়েকটি গানের মধ্যেও নজরুল ধ্বনি ও দৃশ্যপ্রধান চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। যেমন :

মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।
ওয়া হোসেনা ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায়

হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব বর্ণনায় 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' কবিতায় স্থান বাচক বিশেষ্য ও পবিত্র দরূদ শরীফের ব্যবহারে নজরুল এক বিচিত্র চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন :

উর্জ য়্যামেন্ নজ্দ হেজাজ্ তাহামা ইরাক্ শাম
মেসের ওমান্ তিহারান—স্মরি' কাহার বিরাট নাম,
পড়ে "সাল্লালাহু আলায়হি সাল্লাম্।"

রসুলুল্লাহ্র আবির্ভাবে আরব প্রকৃতির উল্লাস বর্ণনায় আরবের ভৌগোলিক দৃশ্যকে অবলম্বনে যে চিত্রকল্প নজরুল সৃষ্টি করেছেন তাও যেমন উজ্জ্বল তেমনি সজীব :

দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশীতে সে বাগে-বাগ,
পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন- জোশীতে রে লাগে আগ,
মরু সাহারা গোবীতে সব্জার জাগে দাগ !

আরবের দক্ষিণের সাগর 'আরবী দরিয়া', পশ্চিমের লোহিতের সাগর 'নীলা লোহিতের খুন' এবং উত্তরের মরুভূমির মরুদ্যান 'সব্জা' মহানবীর আবির্ভাবে দোলায়িত, আনন্দিত উল্লসিত। তারই ফলশ্রুতি চিত্রকল্পটি।

রসুলুল্লাহর আবির্ভাব নিয়ে নজরুলের অনেকগুলো গান রয়েছে, ঐসব নাত-এ-রসুলের কোন কোনটিতে পুষ্প ও চন্দ্রের ব্যবহারে সুন্দর চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে :

সাহারাতে ফুট্ল রে রঙীন গুলে লালা
সেই ফুলেরই খোশ্বুতে আজ দুনিয়া মাতোয়ালা

অথবা

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে ॥

উদ্ধৃত প্রথম চিত্রকল্পটিতে পুষ্পের বর্ণ ও গন্ধে এবং দ্বিতীয়টিতে পূর্ণিমা চাঁদ ও উষার কোলে রাঙা রবির উৎপ্রেক্ষায় শিশু মুহম্মদের আবির্ভাব ও রূপের বর্ণনা ইসলাম ও বৈষ্ণব কবিতার ঐতিহ্য অনুসারী।

"কামাল পাশা" কবিতায় সৈনিকের বেদনা ও বিষাদ অঙ্কনে শহীদ সৈনিকের হতভাগিনী স্ত্রীর রক্তাক্ত স্মৃতিকে উজ্জ্বলতর করে তুলতে নজরুল সন্ধ্যাকাশের রক্তরং আবীরকে ব্যবহার করেছেন নিপুণ শিল্পীর মতো, সন্ধ্যাকাশের টক্‌টকে লাল রঙ-এর উৎপ্রেক্ষায় শহীদ সৈনিক বধূর চিত্রকল্প :

হো হো হো— !
সত্যি তো ভাই ! সন্ধ্যেটা আজ দেখতে যেন সৈনিকেরই বৌ।
শহীদ সেনার টুক্‌টুকে বৌ লাল-পিরহান-পরা,
স্বামীর খুনের ছোপ দেওয়া, তর ডগ্‌ডগে আনকোরা !

সন্ধ্যার আকাশে কবির কল্পনায় ধরা পড়েছে শহীদ সেনার রক্তাক্ত স্মৃতি উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পে :

কল্‌জে যেন টুক্‌রো ক'রে কাটা
হাজার তরুণ শহীদ বীরের—শিউরে ওঠে গাটা
আস্‌মানের ঐ সিং-দরজায় টাঙিয়েছে কোন্‌ কসাই।

সন্ধ্যার আকশটাকে মনে হয়েছে আস্‌মানের সিংহদ্বারে টাননো হাজার তরুণ শহীদ বীরের টুকরো করে কাটা কল্‌জে, সন্ধ্যা আকাশের রঙ্‌ লাল কিন্তু কল্‌জের রঙ কালো, দুটোর মিশ্রিত রূপ :

আসমানের ঐ আঙ্‌রাখা
খুন-খারাবীর-রঙ-মাখা,

অথবা

আস্‌মানে ঐ ভাসমান যে মস্ত দুটো রং-এর তাল
একটা নিবিড় নীল-সিয়া আর একটা খুবই গভীর লাল,

রক্তাক্ত সন্ধ্যাকাশ আর জমাট রক্তের টুকরো কালো কলিজা থেকে কবির কল্পনা সম্প্রসারিত হয়েছে কবরের কালো আঁধারে :

আয় ভাই তোর বৌ এলো ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্তচেলী পরে,
আঁধার শাড়ী পরবে এখন প'শবে যে তার গোরের বাসর-ঘরে।

শহীদ সেনার বধূ তারই বুকের রক্ত আর বাসর ঘর কবরের অন্ধকার—তরই চিত্রকল্প ঐটি। 'কামাল পাশা' কবিতায় চিত্রকল্পগুলিতে রক্তের আর অন্ধকারের রঙ-এর প্রাধান্য। জমাট গভীর শোণিতের বর্ণ লাল থেকে কালোতে রূপান্তরিত হয়, সেদিক থেকে লাল ও কালো রঙ্-এর মধ্যে যে বর্ণগত সাদৃশ্য রয়েছে আলোচ্য চিত্রকল্পগুলিতে তার আভাস রয়েছে।

নজরুলের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবিতা "বিদ্রোহী"। এ কবিতায় আমরা কবির আত্মজাগরণের বিপুল ও বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করি, কবির ব্যক্তিত্বেরও প্রবল স্ফূরণ ঘটেছে এ কবিতায়। কবির এ জাগরণ মূলতঃ আত্মগত হলেও ব্যক্তিত্বের ঐ প্রবল স্ফূরণের কারণে উপমা ও অলংকারে বহির্জগতের রাশি রাশি উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম স্তবকের 'উন্নত শির', 'চির উন্নত শির' হয়ে 'হিমাদ্রি শিখর', 'মহাবিশ্বের মহাকাশ', চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা জ্যোতিষ্কলোক, ভূলোক, দ্যুলোক, গোলক ভেদ করে খোদার আসন 'আরশ' অতিক্রম করে ঊর্ধ্বারোহণের ক্ষিপ্রগতিতে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এ অংশের প্রতীকগুলো গৃহীত হয়েছে মহাকাশ থেকে, আধুনিক রকেটের মহাকাশ থেকে মহাশূন্যে ঊর্ধ্বারোহণের মতোই এ কবিতায় কবি ও পাঠকের অভিজ্ঞতা দ্রুত এবং ঊর্ধ্বগামী, সীমা থেকে অসীমে প্রসারিত, আর তারই চিত্রকল্প :

মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর।

"বিদ্রোহী" কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে যে সব বিশেষণ বা প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে তার অধিকাংশই ধ্বংসাত্মক। প্রকৃতির প্রলয়ংকর রূপ থেকে সংগৃহীত হয়েছে প্রলয়, সাইক্লোন, উল্লিখিত হয়েছ নটরাজ শিব প্রলয়-নৃত্যের দেবতা। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র টর্পেডো মাইনও ব্যবহৃত হয়েছে। শিব উল্লেখিত হয়েছেন ধূর্জটি রূপে। প্রথম স্তবকের শেষে ধূর্জটি ও অকাল বৈশাখী ঝড়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের গতি

ঘূর্ণায়মান, নটরাজের নৃত্যের গতি থেকে তা আগত, প্রকৃতি এখানে পরিবর্তিত ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণিতে। আবার সঙ্গীত রাজ্য থেকে এসেছে হাম্বীর, ছায়ানট, হিন্দোল রাগ-রাগিনীর সুর ও ছন্দ। তৃতীয় স্তবকে পৌরাণিক জগতের হোম-শিখা, জমদগ্নি, যজ্ঞ, অগ্নি, প্রভৃতি পূজা উপাদানের প্রাচুর্য। এই স্তবকেই বিষ্ণুর অষ্টম অবতার বংশ নিধনকারী কালীয় নাগ দমনকারী, কালিন্দীর জল বিষমুক্তকারী কৃষ্ণকণ্ঠের প্রতীকে কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন। সেই চিত্রকল্প :

আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।

"বিদ্রোহী" কবিতার প্রথম চারটি স্তবকে সুর অত্যন্ত চড়া ঘাটে বাধা, তুলনামূলকভাবে পঞ্চম স্তবকে সুর খাদে নামানো। এই স্তবকে কবির চেতনা শান্ত, কোমল ও বেদনার্ত, এ স্তবকে কবির অভিজ্ঞতা পুরাণের জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেছে, প্রকৃতির প্রলয়ংকর দৃশ্যাবলী থেকে দৃষ্টি অপসৃত হয়েছে, এই স্তবকের চিত্রকল্প, বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নের বহ্নি, ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম, উদাসীর উন্মন মন, বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হুতাশীর হা-হুতাশ, পথবাসী চির-গৃহহারা পথিকের বঞ্চিত ব্যথা, অবমানিতের মরম বেদনা, প্রিয় লাঞ্ছিতের বুক জ্বালা। এই স্তবকের চিত্রকল্প রক্তিম আবেগ ও আবেশে উষ্ণ :

আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত-চুম্বন ! চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর-

অথবা

আমি যৌবন-ভীতু পল্লী-বালার আঁচর কাঁচুলি নিচোর।

আবেগের ঐ একই স্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে, গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি/ছল করে দেখা অনুখন অথবা চপল মেয়ের ভালবাসা/তার কাঁকন-চুড়ির কন্-কন্। বিদ্রোহীর চিত্রকল্প পঞ্চইন্দ্রিয়ের সব কয়েকটিকে গ্রাহ্য করেই নির্মিত।

'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' (তিরোভাব) কবিতায় প্রিয় নবীর এন্তেকালে বেদনা ও বিষাদের চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন নজরুল। মৃত্যুদূত আজরাইল ফেরেশতা সকল জীবের প্রাণ সংহার করে থাকেন। কিন্তু রসুলুল্লাহর প্রাণ সংহারে তার বেদনার্ত রূপের চিত্রকল্প :

এ কি বিস্ময় ! আজ্রাইলেরও জলে ভর-ভর চোখ !
বে-দরদ দিল্ কাঁপে থর থর যেন জ্বর জ্বর শোক।

হজরত জিবরাইল (আঃ) আল্লার দূত হিসেবে রসূলুল্লাহর কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাঁর দিশেহারা রূপের চিত্রকল্প :

জিবরাইলের আতশী পাখা সে ভেঙে যেন খান্ খান্
দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান আন্ চান্।

মেঘ, বৃষ্টির ফেরেশতা হজরত মিকাইলের অশ্রু বিসর্জনের চিত্রকল্প, অবিরাম বর্ষণের আদলে সৃষ্ট :

মিকাইল অবিরল
লোনা দরিয়ার সবি জল
ঢালে কুল-মুল্লুকে, ভীম বাতে খায় অবিরল ঝাউ দোল।
এ কি দ্বাদশীর চাঁদ আজ সেই ? সেই রবিয়ল আউওল ?

এমনকি অমঙ্গলের প্রতীক ইবলিস বা শয়তানের চোখেও যে পানি সে অভাবিত দৃশ্যের চিত্রকল্প :

রসূলের দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন রে আজাজিল শয়তান ?
তারও বুক বেয়ে আঁসু ঝরে, ভাসে মদিনার ময়দান !

হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর তিরোভাবে শোকের যে সব দৃশ্য কল্পিত হয়েছে তার মধ্যে স্বর্গীয় অশ্ব বোররাক-এর চিত্রকল্পটি সবচেয়ে অভিনব :

জমিন্-আস্মান জোড়া শির পাঁও তুলি' তাজি বোর্রাক,
চিখ্ মেরে কাঁদে 'আরশের' পানে চেয়ে, মারে জোর হাঁক।

একেশ্বরবাদী বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসে মাটি থেকে মানব দেহের সৃষ্টি আর মৃত্যুর পর মাটিতেই সেই শরীর মিশে যায়, দেশীয় ধারণায় অন্নদাত্রী মৃত্তিকা মাতারূপে পূজিত, আলোচ্য কবিতার তৃতীয় স্তবকে এই দুই ধারণার মিশ্র রূপ থেকে সৃষ্ট উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) -এর মৃত্যুতে বসুন্ধরার শোক ও বিষাদের চিত্রকল্প :

মৃত্তিকা-মাতা কেঁদে মাটি হ'ল বুকে চেপে মরা লাশ
বেটার জানাজা কাঁধে যেন—তাই বহে ঘন নাভিশ্বাস !

রসুলুল্লার মৃত্যুতে তাঁর প্রিয় শিষ্য বেলালের ক্রন্দনের করুণ চিত্রকল্প :

বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে

হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুতে পৃথিবী ও প্রকৃতির বেদনা বিষাদের চিত্রাঙ্কনে বিচিত্র চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন নজরুল :

নিবে গেছে আজ দিনের দীপালি, খসেছে চন্দ্র-তারা,
আঁধিয়ার হ'য়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন-ঝারা !

অথবা

সাগর-সলিল ফোঁপায়ে উঠে সে আকাশ ডুবাতে চায়,
শুধু লোনা জল তার আঁসু ছাড়া কিছু রাখিবে না দুনিয়ায়।

মর্ত ধাম থেকে রসুলুল্লার তিরোধানে বেহেশতের রূপ আনন্দময়, হজরত মোহাম্মদের (সা) আগমন সম্ভাবনায় উল্লসিত বেহেশতের চিত্রকল্পে ঐতিহ্যের মিশ্রণ ঘটেছে :

বেহেশ্‌তে সব আরাস্তা আজ, সেথা মহা ধুম-ধাম,
গাহে হুরপরী যত, "সাল্লাল্লাহো আলায়হি সাল্লাম"।
কাতারে কাতারে করজোড়ে সবে দাঁড়ায়ে গাহিছে জয়—

হুর পরীদের দরুদ শরীফ পাঠ বেহেশ্‌তের পরিবেশ সৃজন করে আর করজোড়ে জয়গান আনে স্বর্গের চিত্র। আলোচ্য কবিতাটির শেষ দিকে রসুলুল্লাহর মাতা আমিনা, পিতা আবদুল্লাহ ও প্রথমা পত্নী খাদিজা বিবির হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে পাওয়ার আনন্দের চিত্রকল্প অঙ্কনে নজরুল বেহেশতের উৎসব ও ধরার শোকের চিত্রকল্পনায় বেহেশতকে অমরা রূপে কল্পনা করেছেন : .

আজ অমরার আলো আরো ঝলমল, সেথা ফোটে আরও হাসি,
শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল, নেমে এলো অমারাশি !

অথবা

আজ স্বরগের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে এ কী ঘন রোল—"সাল্লাল্লাহো আলায়হি সাল্লাম।

নজরুলের অন্যতম বিখ্যাত কবিতা "প্রলয়োল্লাস", ঝড় বিশেষতঃ কালবৈশাখীর ঝড় নজরুলের অত্যন্ত প্রিয় প্রতীক, নজরুল নিজের পরিচয়কে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে

বার বার ঝড়ের প্রতীককে ব্যবহার করেছেন, ঝড় বা কালবৈশাখী নজরুলে নিছক প্রকৃতির রুদ্ররূপ বর্ণনার জন্যে ব্যবহৃত হয়নি বরং সংঘাত, সংগ্রাম, পরিবর্তন, পুরাতনের বিলোপ ও নূতনের আবাহনের রূপক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। কালবোশেখীর ঝড় নজরুলে নূতনের কেতনের চিত্রকল্প, তিনি যার জয়ধ্বনি করার আহ্বান জানিয়েছেন কবিতাটির প্রতিটি স্তবকে। ঝড়ের চিত্রকল্পে ভয়ঙ্করের আগমনকে এ কবিতায় প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল যে ভয়ঙ্কর শক্তি সিন্ধুপারের সিংহদ্বারের আগলকে ধমক হেনে ভেঙে দিল, মৃত্যুগহন অন্ধকূপে মহাকালের চণ্ডরূপে বজ্রশিখার মশাল জেবলে ধূম্র ধূপে সে ভয়ঙ্করের যে চিত্রকল্প নজরুল অঙ্কন করেছেন তা বাহ্যতঃ প্রকৃতির রুদ্র রূপের প্রতিমূর্ত্তি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আকাঙ্খিত বিপ্লবেরই চিত্রকল্প। "প্রলয়োল্লাস" কবিতার তৃতীয় স্তবকে প্রকৃতির সেই ক্ষুব্ধ ও অশান্ত রূপের চিত্রকল্প পাই :

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়
সর্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর চুলায়।

নূতনের ভয়ঙ্করের ঐ চিত্রকল্প চতুর্থ স্তবকে রুদ্র বৈশাখের চিত্রকল্পে পরিবর্তিত :

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়
দিগন্তের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়।

কবিতাটির পঞ্চম স্তবকে ঝড়ের ভয়ঙ্কর ও প্রলয়ঙ্কর রূপের এক বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করি, ঝড়, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুতাহত অসীম আকাশকে তীব্রগতিসম্পন্ন অশ্বরূপে কল্পনা করে সৃষ্ট হয়েছে নিম্নোক্ত অভিনব চিত্রকল্পটি :

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে !
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে।

এরূপ চিত্রকল্প নজরুলের মৌলিক কবি প্রতিভার সৃষ্টি ও বাংলা কবিতায় নূতন সংযোজন। বিশেষতঃ "ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে" চিত্রকল্পটি তুলনারহিত।

নজরুলের অপর একটি প্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত প্রতীক 'ধূমকেতু'। সাধারণ ধারণায় অমঙ্গল ও অশুভ সম্ভাবনার প্রতীক এই জ্যোতিষ্কটিকে নজরুল ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'ধূমকেতু' কবিতায় এ জ্যোতিষ্কটি স্রষ্টার শনি,

মহাবিপ্লবের হেতু, কবি সত্তার স্বরূপ এবং স্রষ্টার বিরুদ্ধে সৃষ্টির বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত। ধূমকেতুর চিত্রকল্পে পৌরাণিক ধারণায় নির্মিত :

সাত-সাত শ' নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে।
মম ধূম-কুণ্ডলী করেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে।

আবার 'ধূমকেতু' কবিতায় যখন আধুনিক উপমা, উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে চিত্রকল্প নির্মিত হয় তখন তা হয় জ্বালাময় ও শ্বাসরোধকারী :

কচি শিশু-রসনায় ধানী-লঙ্কার পোড়া ঝাল,
আর বন্ধ কারায় গন্ধক ধোঁয়া, এসিড, পটাশ, মোম্‌ছাল,
আর কাঁচা কলিজায় পচা ঘা'র সম সৃষ্টিরে আমি দাহ করি।

নজরুলের চিত্রকল্পের মতো নজরুলের উপমাও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, মূর্ত। রবীন্দ্রনাথের উপমা বিমূর্ত কিন্তু রোমান্টিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হলেও নজরুলের উপমা এবং চিত্রকল্প বিমূর্ত্ত নয়, নজরুল তাঁর "ধূমকেতু" কবিতায় মানুষের মনগড়া বিধাতার স্থবির রূপের বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে ভগবানের অসহায় রূপের চিত্রাঙ্কনে নিম্নোক্ত দুইটি উপমা :

কাল বাঘিনী যেমন ধরিয়া শিকার
তখনি রক্ত শোষে না তার,
দৃষ্টি-সীমায় রাখিয়া তাহারে উগ্র-চণ্ড সুখে
পুচ্ছ সাপটি' খেলা করে আর শিকার মরে সে ধুকে ;
তেমনি করিয়া ভগবানে আমি
দৃষ্টি-সীমায় রাখি দিবাযামী,
ঘিরিয়া ঘিরিয়া খেলিতেছি খেলা, হাসি' পিশাচের হাসি
এই অগ্নি-বাঘিনী আমি সে সর্বনাশী।

অথবা

অথবা যেন রে অসহায় এক শিশুরে ঘিরিয়া
অজগর কাল-কেউটা সে কেনো ফিরিয়া ফিরিয়া
চায়, আর ঘোরে শন্ শন্ শন্,
ভয়-বিহ্বল শিশু তার মাঝে কাঁপে রে যেমন—
তেমনি করিয়া ভগবানে ঘিরে
ধূমকেতু-কালনাগ অভিশাপ ছুটে চলেছি রে ;
আর সাপে-ঘেরা অসহায় শিশু সম
বিধাতা তোদের কাঁপিছে রুদ্র ঘূর্ণির মাঝে মম !

উদ্ধৃত উপমা দুইটি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও মূর্ত্ত অর্থাৎ ক্লাসিকধর্মী উপমা, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যেমন উপমার ছড়াছড়ি। রবীন্দ্রনাথের উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প রোমান্টিক ধর্মী—তা মূলতঃ অস্পষ্ট, অপ্রত্যক্ষ ও বিমূর্ত্ত। নজরুলের কবি-প্রেরণা রোমান্টিক কিন্তু কবিতায় অলংকার ব্যবহার ক্লাসিকধর্মী, বিশেষতঃ উদ্দীপনামূলক কবিতায়। আলোচ্য প্রবন্ধে নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে রচিত কয়েকটি বিখ্যাত উদ্দীপনামূলক কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহারের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল তাতে প্রতীক ও মূর্ত্তরূপের প্রতি নজরুলের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্বের উদ্দীপনামূলক কবিতায় চিত্রকল্প সৃষ্টিতে নজরুল যে হিন্দু পুরাণ, মুসলিম ইতিকথা ও প্রকৃতির প্রমত্ত রূপ থেকে মূলতঃ উপাদান সংগ্রহ করেছেন তার একটা প্রধান কারণ অবশ্য কবিতাগুলির বিষয়বস্তু। সমকালীন জীবনের বিপর্যয়, সংঘাত এবং জাগরণ প্রায়শঃই নজরুলে পৌরাণিক রূপকে বা ইতিকথার ছলে প্রকাশিত। সুতরাং উপমা, উৎপেক্ষা ও চিত্রকল্পের জন্যেও কবিকে পুরাণ বা কিংবদন্তীর রাজ্যেই বিচরণ করতে হয়েছে। পরবর্তী কালে যৌবনের জয়গানে মুখরিত উদ্দীপনামূলক কবিতায় নজরুল পুরাণের রাজ্য থেকে প্রকৃতির রাজ্যে বিচরণ করেছেন অধিক, প্রকৃতির প্রমত্ত রূপ থেকে চিত্রকল্প আহরণ অবশ্য প্রথম পর্বের উদ্দীপনামূলক কবিতাতেও লক্ষ্য করা যায় ; পরবর্তীকালে তারই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে।